উনচল্লিশতম অধ্যায়

হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি

প্রসঙ্গ ঃ ওমরাহ, বাইয়াতে রিদ্‌ওয়ান, ইলমে গায়েব প্রকাশ, হাউযে কাউছারের পানি প্রবাহ, উম্মতের মাগফিরাতের আয়াত নাযিল

মক্কার ৯ মাইল উত্তর-পশ্চিমে হোদায়বিয়া অবস্থিত । এটি একটি কূপের নাম। পরবর্তীতে স্থানের নামও হোদায়বিয়া হিসেবেই পরিচিতি লাভ করে। এইস্থানে নবী করিম (দঃ) ও কোরাইশদের মধ্যে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলক্বদ মাসে। এই অসম চুক্তিটি ছিল নবী করিম (দঃ) এবং মুসলমানদের জন্য রাজনৈতিক মহাবিজয় এবং মক্কা বিজয়ের প্রথম সোপান স্বরূপ।

এই চুক্তির মাধ্যমে কোরাইশগণ মুসলমান ও ইসলামী রাষ্ট্রকে একটি পক্ষ ও শক্তি বলে স্বীকৃতি দান করে এবং দশ বৎসরের জন্য স্বাধীনভাবে ধর্ম প্রচারের সুযোগ প্রদান করে। সুতরাং ইসলামের ইতিহাসে এই সন্ধিচুক্তিকে স্পষ্ট বিজয় বলে কোরআন মজিদে ঘোষণা করা হয়েছে।

৫ম হিজরী সনে খন্দকের যুদ্ধ শেষে নবী করিম (দঃ) ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন– **"এ বৎসরের পর হতে কোরাইশগণ আর আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারবে না"**। হুযুর (দঃ)-এর ভবিষ্যৎবানী এক বৎসরের মধ্যেই ফলে গেলো। "তিনি স্বপ্নে দেখলেন– আপন সঙ্গীগণকে নিয়ে তিনি মক্কা মোয়ায্যমায় প্রবেশ করছেন এবং তাওয়াফ শেষে সায়ী করে কেউ মাথা মুন্ডন করছেন, কেউ চুল ছাঁটছেন এবং নিরাপদেই তিনি ওমরা সমাধা করছেন" (সুঁরা আল-ফাত্‌হ)।

এই স্বপ্ন ছিল ভবিষ্যৎ বিজয়ের ইঙ্গিতবহ। এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে মোহাজির সাহাবীগণ জন্মভূমি দর্শন এবং আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার জন্য উতাল হয়ে উঠলেন। ছয় বৎসর পূর্বে মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদিনায় এসেও মুসলমানরা শান্তিতে থাকতে পারেননি। বদর, ওহোদ, খন্দক–প্রভৃতি যুদ্ধে তারা ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। সুতরাং মাতৃভূমির মাটি তাঁদেরকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে লাগলো। নবী করিম (দঃ) চৌদ্দশত সাহাবী নিয়ে– (যাদের অধিকাংশই ছিলেন মোহাজির) মক্কার উদ্দেশ্যে ওমরা করার নিয়তে রওনা হলেন যিলক্বদ চাঁদের ১লা তারিখ সোমবার দিন। সাথে নিলেন কোরবানীর উট। তখনও হজ্ব ফরয

www.sunnibarta.com

হয়নি। তাই ওমরার এই ব্যবস্থা। সাথে নিলেন উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সাল্‌মা (রাঃ) কে। আত্মরক্ষামূলক খাপযুক্ত সাধারণ অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধের কোন অস্ত্রই সাথে ছিল না। কাজেই এই সফর ছিল শুধু ধর্মীয় সফর।

মদিনার সামান্য দূরে 'যুল হোলায়ফা' নামক স্থানে গিয়ে তিনি ওমরার এহ্‌রাম পরিধান করে তাল্‌বিয়া পড়ে– অর্থাৎ "লাব্বায়েক" বলে মক্কা মোয়ায্‌যমার পথে রওনা দিলেন। বনু খোযাআ গোত্রের একজনকে মক্কাবাসীদের প্রতিক্রিয়া জানার উদ্দেশ্যে আগে প্রেরণ করলেন। সে এসে সংবাদ দিল– কোরাইশগণ নবী করিম (দঃ)-এর কাফেলাকে বাঁধা দিবে এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ করবে। এই সংবাদ পেয়ে নবী করিম (দঃ) সাহাবীদেরকে নিয়ে মক্কা শরীফের ৯ মাইল দূরে হোদায়বিয়া ময়দানে তাঁবু ফেললেন এবং হযরত ওসমান (রাঃ) কে নিজেদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য কুরাইশদের নিকট মক্কায় প্রেরণ করলেন। আবু সুফিয়ান হযরত ওসমানকে সাদরে গ্রহণ করলো।

"প্রথমে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করে পরে কথাবার্তা হবে"– আবু সুফিয়ান এই প্রস্তাব দিল। হযরত ওসমান (রাঃ) বললেন- "আমার প্রিয় নবীর পূর্বে আমি আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে পারিনা। প্রিয় নবীর সম্মান আল্লাহর ঘরের সম্মানের চাইতেও অনেক বেশী"। একথা শুনে আবু সুফিয়ান ও অন্য নেতৃবর্গ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং হযরত ওসমানকে আটক করে রাখ্‌লো। হোদায়বিয়ায় মুসলমানদের তাঁবুতে গুজব-সংবাদ পৌঁছানো হলো যে, হযরত ওসমান (রাঃ) কে শহীদ করে ফেলা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল–হযরত ওসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য।

নবী করিম (দঃ) এই অবস্থা দর্শনে সকলকে একটি ছামুরা (বাবলা) গাছের নীচে ডেকে আনলেন। তিনি শান্তভাবে তাঁদের মতামত জানতে চাইলেন। সবাই এক বাক্যে কথিত ওসমান হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার সংকল্প ঘোষনা করলেন। দূত হত্যা সকল ধর্মেই নিষিদ্ধ এবং তার পরিণতিও মারাত্মক। নবী করিম (দঃ) সাহাবায়ে কেরামের এই সংকল্পকে "বাইয়াতে" রূপদান করলেন।

আল্লাহ-রাসুলের রেযামন্দি অর্জন ও যুদ্ধ করার লক্ষ্যে এই বাইআত অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে এই বাইআতকে বাইআতে রিদওয়ান ও বাইআতে কিতাল বলা হয়। নবী করিম (দঃ)-এর ডানহাত মোবারকের নীচে সকলে ডান হাত রেখে এই বাইআত বা অঙ্গীকার করেছিলেন বলে এটাকে "বাইআতে রাসুলও" বলা হয়। কোরআন মজিদে এই বাইআতে রিদওয়ান বা বাইআতে কিতালকেই বাইআতে রাসুল বলা হয়েছে।

www.sunnibarta.com

বাইআতে শেখ সুন্নাতঃ

[বাইআত গ্রহণ করা সুন্নাত। তাই বাইআতে খিলাফত ও বাইআতে শেখ–উভয়টিই সুন্নাত। রাসূলে পাক (দঃ)- এর পরবর্তীকালে চার খলিফা মানুষের নিকট থেকে নিজেদের জন্য ঐ পদ্ধতিতেই "খেলাফত ও তরিকতের" বাইআত গ্রহণ করতেন। অর্থাৎ- জাগতিক ও আধ্যাত্মিক– উভয় প্রকারের বাইআত খোলাফায়ে রাশেদীন গ্রহণ করতেন (বোখারী ও মুসলিম)। ইহাই বাইআতে শেখের দলীল। বাইআতে আবুবকর, বাইআতে ওমর, বাইআতে ওসমান, বাইআতে আলী, বাইআতে হাছান ও বাইআতে হোসাইন ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁদের নামে তাঁদের হাতে লোকেরা বাইআত করতো (বুখারী)। ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর নামে কুফাবাসীরা ইমাম মুসলিমের হাতে বাইআত করেছিল। কাওলুল জামিলে বর্ণিত বাইআত পদ্ধতি খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এবং পরবর্তী যুগেও ছিলনা।

খেলাফতের যুগ শেষ হয়ে গেলে রাজতন্ত্রের যুগ শুরু হয়। তখন থেকেই জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের যৌথ বাইআত প্রথা রহিত হয়ে যায়। জাগতিক বাইআত করা হতো কথিত খলিফাদের নামে– কিন্তু আধ্যাত্মিক বাইআত করা হতো ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ইমামগণের হাতে। এভাবে তখন থেকেই অদ্যাবধি বাইআতে ছিয়াছাত এবং বাইআতে শেখ পৃথক পৃথক ভাবে চলে আসছে।

তাফসীরে রুহুল বয়ান সুরা আল ফাতাহ্-এর বর্ণনা অনুযায়ী "বাইআতে শেখ" বাইআতে রাসুলেরই প্রতিনিধিত্বকারী এবং বাইআতে রাসুল মূলতঃ বাইআতুল্লাহরই প্রতিনিধিত্বকারী। এই কারণেই তরিকতের তিনটি স্তর ফানা ফিশ শেখ, ফানা ফির রাসুল এবং ফানা ফিল্লাহ– নির্ধারিত হয়েছে। ফানা ফিস শেখ হলো ফানা ফির রাসুলের পূর্বশর্ত এবং ফানা ফির রাসুল হলো ফানা ফিল্লাহর পূর্বশর্ত। (ইরগামুল মুরিদীন)।

প্রতিনিধিত্বকারী বাইআতের পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। ওয়াছেতা বা পীরের মাধ্যম ছাড়া সরাসরি বাইআতে রাসুল হতে পারেনা। আল্লাহর কালাম "ওয়াব্তাগো ইলাইহিল ওয়াছিলা" এই আয়াতে ওয়াছিলার অর্থ আহলে সুন্নাতের মতে পীর ধরা বা পীরের হাতে বাইয়াত হওয়া। এই প্রভেদ না জানার কারণেই কোন কোন পীর বুযর্গদের মধ্যে বাইআতে শেখ ও বাইআতে রাসুল নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা সংঘাত নেই।

www.sunnibarta.com

বাইআতে শেখই মূলতঃ বাইআতে রাসুল এবং বাইআতে রাসুলই মূলতঃ বাইআতুল্লাহ (রুহুল বয়ান)।

তাফসীরে ছাভী-তে বলা হয়েছে- "বাইআতে রিদওয়ান" আয়াতটির নুযুল খাস হলেও হুকুম আম। অর্থ্যাৎ বাইআতে শেখ ও বাইআতে ইমাম উক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আরবী এবারত দেখুন-

هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَاِنْ كَانَ سَبَبُ نُزُوْلِهَا بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ اِلَّا اَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ فَيَشْتَمِلُ مُبَايَعَةَ الْاِمَامِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَمُبَايَعَةَ الشَّيْخِ الْعَارِفِ عَلٰى مَحَبَّةِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -

অর্থ-সুরা আল ফাতহ ১০ নম্বর আয়াতে বাইআতে রিদওয়ান শব্দ উল্লেখ থাকলেও তার হুকুম আম বা ব্যাপক। অতএব বাইআতে ইমাম বা শাসক এবং বাইআতে শেখ উক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। শাসক বা ইমামের নিকট বাইআত করার অর্থ তার আনুগত্য ও ওয়াদা পূর্ণ করার শপথ। আর বাইআতে শেখের অর্থ হলো- শেখে আরেফের নিকট আল্লাহ ও রাসুলের মহব্বৎ হাসেলের জন্য শপথ করা। (তাফসীরে ছাভী সুরা আল-ফাতহ, ১০ আয়াত)

সুতরাং আয়াতের ব্যাপক অর্থ হবে এভাবে- "যারা রাসুলের হাতে বাইআত করে কিংবা পীর অথবা ন্যায়পরায়ণ শাসকের হাতে বাইআত করে-তারা মূলতঃ আল্লাহর হাতেই বাইআত করে-তাঁদের হাতের উপরেই আল্লাহর হাত রয়েছে"। (তাফসীরে ছাভী, সুরা আল-ফাতহ, ১০ আয়াত মর্ম)।

হযরত বায়েযীদ বোস্তামী (রহঃ) স্বীয় ভক্ত আবুল হাছান খারকানী (রহঃ) কে স্বপ্নে বলেছিলেন- "পৃথিবীর উপরে জীবিত পীরের কাছে তুমি মুরীদ হইও। কেননা, এটাই সুন্নাত" (ইরগামুল মুরিদীন)।

বাইআতে রিদওয়ান গ্রহণঃ

হুযুর (দঃ) সকল সাহাবীকে ছামুরা গাছের নীচে একত্রিত করে নিজের ডান হাত মোবারক সাহাবীগণের ডানহাতের উপরে স্থাপন করে জেহাদের বাইআত বা অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। তিনি আপন বাম হাত নিজ ডান হাতের নীচে স্থাপন করে বললেন, **"আমি ওসমানের পক্ষে এই বাইআত গ্রহণ করছি"**।

একথা বলার সাথে সাথে সকলে বুঝে ফেললেন যে, হযরত ওসমান এখনও জীবিত আছেন। কেননা, মৃত লোকের পক্ষে কোন বাইআত হতে পারেনা। নবী করিম (দঃ) একদিকে জেহাদের বাইআত বা অঙ্গীকার গ্রহণ করে নিলেন,

www.sunnibarta.com

অপরদিকে হযরত ওসমানের বেঁচে থাকারও গায়েবী সংবাদ দিয়ে দিলেন। প্রয়োজনের সময়ই নবী করিম (দঃ) কাজের মাধ্যমে "ইলমে গায়েব" প্রকাশ করতেন। এটা ছিল আল্লাহ প্রদত্ত এলেম। সুতরাং কোরআনের যে যে স্থানে আমভাবে বলা হয়েছে–"আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানে না"–তার অর্থ হচ্ছে **"নিজে নিজে এলমে গায়েব কেউ জানেনা"**। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত এলমে গায়েব-এর নিষেধাজ্ঞামূলক কোন আয়াত বা হাদীস নেই–বরং আল্লাহ নিজে রাসুল (দঃ) কে ইলমে গায়েব শিক্ষা দিয়েছেন বলে সুরা নিছার-১৩৩ আয়াতে উল্লেখ আছে (জালালাঈন)। আয়াতটি হলো– وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (مِنَ الْاَحْكَامِ وَالْغَيْبِ)

তাহ্কীক ঃ (ইলমে গায়েব)

[ইল্‌ম শব্দটি বাবে ছামিয়া-ইয়াছ্‌মাউ سَمِعَ يَسْمَعُ হতে নির্গত হলে তার অর্থ হয় "নিজে নিজে জানা", আর বাবে তাফ্‌ঈল (تَعْلِيْمٌ) হতে নির্গত হলে তাঁর অর্থ হয়–"অন্য কর্তৃক অবগত করানো"। নবী করিম (দঃ)-এর ক্ষেত্রে প্রথমটি নিষিদ্ধ, কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রমাণিত। উভয়টিরই উল্লেখ কোরআনে আছে। যেমন- প্রথমটির দলীল হলো **"লা-ইয়ালামু মান্ ফিস্ সামাওয়াতে ওয়াল আরদিল গায়বা ইল্লাল্লাহু"**– অর্থাৎ **"আসমান-জমিনের কেউই নিজে নিজে গায়েব জানে না-একমাত্র আল্লাহ ছাড়া"**। অপরদিকে দ্বিতীয়টির দলীল হলো **"ওয়া আল্লামাকা মা-লাম্ তাকুন তা'লাম" অর্থাৎ "আপনি নিজে নিজে যা কিছু জান্‌তেন না, তা সবই আল্লাহ্ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন"**। (সূরা নিসা– ১১৩ আয়াত জালালাঈন ব্যাখ্যা করেছেন"–ইলমুল আহকাম ও ইলমুল গায়েব–অর্থ্যাৎ "আল্লাহ নিজে আপনাকে ইলমুল আহকাম ও ইলমুল গায়েব শিক্ষা দিয়েছেন"।

সুতরাং ইলমে গায়েব দু-প্রকার মানতেই হবে। এক প্রকার হলো– নিজে নিজে জানা, আর এক প্রকার হলো- আল্লাহর মাধ্যমে জানা। প্রথমটিকে বলা হয় ইল্‌মে গায়েব যাতি। এটা আল্লাহর জন্য খাস। আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় ইলমে গায়েব আতায়ী বা আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে গায়েব। এটা নবী রাসুল এবং তাঁদের মাধ্যমে ওলী আল্লাহদের জন্য খাস। যাতি ইল্‌মে গায়েব আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য মানা যেমন কুফরী ও শেরেকী কাজ–তদ্রূপ আতায়ী ইল্‌মে গায়েবও আল্লাহর জন্য মানা নাজায়েয এবং হারাম। কেননা, আল্লাহর নিজ ইল্‌ম আতায়ী (প্রদত্ত) হতে পারেনা। এই প্রভেদটুকু না জানার কারণেই এক শ্রেণীর ওহাবী আলেম ঢালাওভাবে নবী করিম (দঃ)-এর ইল্‌মে গায়েব আতায়ীকে অস্বীকার করে বসে। এটা তাদের মূর্খতার পরিচায়ক। আল্লাহ্ নিজেই বলেন–"হে হাবীব! আপনার প্রভূ আপনাকে অজানার গায়েবী এলেম নিজে শিক্ষা দিয়েছেন"। (জালালাঈন সুরা নিসা ১১৩ আয়াত)।

www.sunnibarta.com

ওহাবী আলেমদের খপ্পরে পড়ে স্বঘোষিত নামধারী দারুস সালামের জাহেল পীর আবদুল কাহহার সাহেবও নবী করিম (দঃ)-এর আল্লাহ্ প্রদত্ত ইল্‌মে গায়েবকে অস্বীকার করে বিজ্ঞাপন ছেড়েছে ১৯৯৪ইং সালে। এ অধম বাধ্য হয়ে তাঁর উক্ত বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে ১৯৯৫ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে চ্যালেঞ্জ করে বাহাছের আহবান করেছিলাম। কিন্তু এখন পর্যন্ত উক্ত পীর সাহেবের কোন প্রতিক্রিয়া নযরে পঁড়ছেনা। ইতিমধ্যে তিনি বাহাছের চ্যালেঞ্জ মাথায় নিয়ে কবরে চলে গেছেন।]

চুক্তি সম্পাদন ঃ

যাই হোক–মক্কার কোরাইশ এবং নবী করিম (দঃ)-এর মধ্যে দূত বিনিময় হতে লাগলো এবং আলাপ আলোচনা চল্‌তে থাকলো। **আমর নামের প্রথম দূত কোরাইশদেরকে গিয়ে বলেছিল- "আমি তাঁদের তাবুতে গিয়ে দেখলাম– নবীর সাহাবীগণ কথিত ওসমান হত্যার প্রতিশোধ নিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন। তারা জান দিতে প্রস্তুত। অপরদিকে তোমাদের জানের মায়া রয়েছে। নবীর সাহাবীগণ তাঁদের নবীর দিকে চোখ তুলে কথা বলেন না। যখন তিনি কথা বলেন-তখন তাঁর সাথীগণ মৃতদেহের ন্যায় নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তিনি যখন থুথু ফেলেন বা নাসিকা পরিষ্কার করেন, তাঁর সাথীগণ ঐসব জিনিষ পবিত্র ও তাবাররুক জ্ঞানে নিজেদের গায়ে-মুখে মালিশ করে নেন। তিনি ওযু করার সময় তাঁর ব্যবহৃত পানি সাহাবীগণ মাথায় ও মুখে-বুকে মালিশ করে নেন। আমি অনেক রাজা বাদশাহর দরবারে দৌত্যগীরি করেছি, কিন্তু এমন মর্যাদাবান কাউকে পাইনি। সুতরাং তাদের সাথে যুদ্ধ করলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী"।**

আমরের মুখে একথা শুনে কোরাইশ নেতারা ঘাবড়িয়ে যায়। তারা হযরত ওসমানকে ছেড়ে দেয় এবং সন্ধিচুক্তির খসড়া তৈরীর জন্য সোহায়লকে প্রেরণ করে। সোহায়ল নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি তার সাথে আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কেননা, তার নামটি ছিল সোহায়ল বা সহজ।

অনেক আলোচনার পর দশ দফা ভিত্তিক একটি চুক্তিনামার খসড়া প্রস্তুত করা হয়। দশ দফা ভিত্তিক খস্‌ড়া চুক্তির মধ্যে কয়েকটি দফা বা শর্ত মুসলমানদের জন্য খুবই কষ্টদায়ক ছিল। যেমন ঃ (১) এ বৎসর মুসলমানদেরকে ওমরা করতে দেয়া হবে না (২) আগামী বৎসর নবীজী ও মুসলমানদেরকে তিন দিনের জন্য মক্কায় অবস্থান করে ওমরা করার সুযোগ দেয়া হবে। তবে সাথে উন্মুক্ত

www.sunnibarta.com

তরবারী রাখা যাবে না (৩) মক্কার কেউ মুসলমান হয়ে মদিনায় আশ্রয় নিলে তাকে ফেরত দিতে হবে। (৪) মদিনার কোন মুসলমান মক্কায় আশ্রয় নিলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না।

অপর পক্ষে কয়েকটি ধারা ছিল যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য। যেমন (৫) আগামী দশ বৎসরের জন্য যুদ্ধ বিরতি বহাল থাকবে। (৬) মক্কা সংলগ্ন বনু বকর গোত্র কোরাইশদের আশ্রয়ে থাকবে এবং মদিনা সংলগ্ন বনু খোযাআ গোত্র নবী করিম (দঃ)-এর আশ্রয়ে থাকবে। (৭) এই দুই গোত্রের যে কোন একটির উপর হামলা করা হলে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ হয়ে যাবে (৮) চুক্তির মেয়াদকালে উভয় পক্ষের লোকজন মক্কা ও মদিনায় অবাধে যাতায়াত করতে পারবে। (৯) **চুক্তির মেয়াদকালে যার যার ধর্ম পালন ও প্রচার করার স্বাধীনতা থাকবে।**

শেষোক্ত ধারাগুলোর মধ্যে নবী করিম (দঃ) আপন নবুয়তী জ্ঞান দ্বারা সুদূর প্রসারী বিজয় লক্ষ্য করে চুক্তি স্বাক্ষরে সম্মতি দিলেন। চুক্তিনামা স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হলে নবী করিম (দঃ)-এর নাম এভাবে লেখা হলো–"মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর পক্ষে" .....। সোহায়ল একথায় আপত্তি জানিয়ে বললো– "রাসুলুল্লাহ" শব্দটি বাদ দিতে হবে এবং তদস্থলে "ইব্নে আবদুল্লাহ" লিখ্তে হবে। হযরত ওমর রাগে গর্জে উঠলেন। এমন অপমানজনক শর্তে কিভাবে চুক্তি হতে পারে- ইয়া রাসুলাল্লাহ? নবী করিম (দঃ) শান্তস্বরে বললেন, "আমিতো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রাসুল– এটা লিখা বা না লিখার মধ্যে এমন কিছু আসে যায়না। আমি যে ইব্নে আবদুল্লাহ্- এটাও তো সত্য। হযরত আলীকে 'রাসুলুল্লাহ' শব্দটি মুছে ফেল্তে তিনি নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) আদবের সাথে ঐ শব্দ মুছে ফেলতে অস্বীকৃতি জানালেন। একদিকে নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব–অন্যদিকে আদব রক্ষা করা ফরয। নির্দেশ পালনের উপরে হলো আদবের স্থান।

তাই হযরত আলী (রাঃ) অস্বীকৃতি জানিয়ে আদব রক্ষা করলেন (সোবহানাল্লাহ)। নবী করিম (দঃ) আবদুল্লাহ শব্দটি নিজহাতে লিখে দিলেন। আল্লামা খরপুতি (রঃ) কাছিদায়ে বুরদা শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন–

وَفِىْ حَدِيْثٍ يُرْوٰى عَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّهٗ كَانَ يَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهٗ اِلْقِ الدَّوَاةَ وَحَرِّفِ الْقَلَمَ وَاَقِمِ الْبَاءَ وَفَرِّقِ السِّيْنَ وَلَا تُعَوِّرِ الْمِيْمَ مَعَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكْتُبْ وَلَمْ يَقْرَأْ

www.sunnibarta.com

অর্থাৎ-"হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি হুযুর (দঃ)-এর সামনেই অহী লিখার কাজ করতেন। রাসুলে পাক (দঃ) তাঁকে এভাবে নির্দেশ দিতেন-"দোয়াত এভাবে রাখ, কলমকে ঘুরাও, "ক্বা" হরফ সোজা করো, "ছীন" হরফটি পৃথক করে লিখ, মীম হরফকে বাকা করোনা"- অথচ তিনি (দঃ) লিখার পদ্ধতি কোরআন নাযিলের পূর্বে কোনদিন শিখেননি এবং পূর্ববর্তী কোন কিতাবও পাঠ করেননি" (খরপুতি-শরহে বুরদা)। বুঝা গেল-আল্লাহ্পাক কোরআন শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে কোরআন লিখন পদ্ধতিও শিক্ষা দিয়েছেন। তা না হলে তিনি নির্দেশ দিতেন কি করে?

এতে প্রমাণিত হলো- নবী করিম (দঃ) প্রচলিত অর্থে নিরক্ষর ছিলেননা- বরং তিনি ছিলেন উম্মি বা সৃষ্টির মূল। তাফসীরে রুহুল বয়ানের গ্রন্থকার সুরা আরাফে উম্মি শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন- **"নবী করিম (দঃ)-এর উম্মি হওয়ার অর্থ-তিনি সৃষ্টির মূল-অর্থাৎ উম্মুল খালায়েক। যেমন, উম্মুল কোরা মক্কা শরীফকে বলা হয় এবং উম্মুল কোরআন সুরা ফাতিহাকে বলা হয়-তদ্রূপ উম্মি শব্দটির অর্থ সৃষ্টির মূল। ইহা নবী করিম (দঃ)-এর একক বৈশিষ্ট্য। অন্য কোন নবী এই উপাধীতে ভূষিত ছিলেননা। দুনিয়ার কলম কাগজের সাহায্য নেয়ার কোন প্রয়োজনই হয়নি নবী করিম (দঃ)-এর। কেননা, আল্লাহর কুদরতী কলম ছিল নবী করিম (দঃ)-এর আজ্ঞাবহ খাদেম এবং লওহে-মাহফুয ছিল হুযুর (দঃ)-এর কিতাব বা দৃষ্টিস্থল।** (তাফসীরে রুহুল বয়ান ৯ পারা)।

যুক্তিতেও বলে-তিনি নিরক্ষর হতে পারেন না। কেননা, তিনি সাহাবীদেরকে দিয়ে কোরআন লিখিয়েছেন এবং নিজে হরফ লেখার পদ্ধতির নির্দেশনা দিয়েছেন। নিজে নিরক্ষর হলে কি বিশুদ্ধভাবে অহী লেখানো সম্ভব হতো? তবে তিনি ইচ্ছা করেই লিখতেন না। (খরপুতি শরহে কাসিদায়ে বুরদা)।

পানির ফোয়ারা ঃ

হোদায়বিয়ার ময়দানে নবী করিম (দঃ) সাহাবাগণকে নিয়ে ১৯ দিন অবস্থান করেছিলেন। শুষ্ক মরুভূমিতে এমনিতেই পানির অভাব। চৌদ্দশত সাহাবীর সাথে রক্ষিত পানি অল্প সময়ের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। সাহাবাগণ পানির অভাবের কথা এবং তীব্র পিপাসার কথা নবী করিম (দঃ)-এর খেদমতে পেশ করলেন। হুযুর আকরাম (দঃ) এরশাদ করলেন-"কারও কাছে সামান্য কিছু পানি আছে কিনা"? সাহাবাগণ আরয করলেন-আপনার লোটাতেই কেবল সামান্য পানি আছে। হুযুর পুরনূর (দঃ) লোটার উপরে পবিত্র ডান হাত স্থাপন করলেন। অমনি পাঁচ আঙ্গুলের চারটি ফাঁক দিয়ে ৪টি পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হলো।

www.sunnibarta.com

পানি উপচে পড়তে লাগলো। সাহাবাগণকে তিনি আহবান করলেন–যার যার প্রয়োজন মত পানি সংগ্রহ করার জন্য। চৌদ্দশত সাহাবী নিজেদের প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করে নিলেন। তারপর নবী করিম (দঃ) হাত মোবারক তুলে নিলেন। পানিপ্রবাহ সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল। বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) উক্ত হাদীস বর্ণনাকালে তাঁকে প্রশ্ন করা হলো- **"আপনারা ঐ সফরে কতজন সাথী ছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন– আল্লাহর শপথ! যদি আমরা একলক্ষ লোকও হতাম, তবুও ঐ পানি আমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারতো। আমরা ছিলাম মাত্র চৌদ্দশত"** (সোবহানাল্লাহ)।

ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ) উক্ত ঘটনাকে উর্দূ কবিতায় কত সুন্দর করে বর্ণনা করেছেনঃ

"নূরকে চশ্‌মে লেহ্‌রায়ে দরিয়া বহে
অংলিউ কি কারামত পে লাখো ছালাম"।

অর্থ ঃ 'নূরের নহর নয়তো- যেন সাগর বহমান
অঙ্গুলীরই কারামতে লাখো ছালাম'।

উক্ত ঘটনায় কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় –

(১) পানির সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে একটি আবাদী এলাকা বিরান হয়ে যায়। সরকারী ব্যবস্থাপনায় ইঞ্জিনিয়ার, পাইপ, টিউব সংগ্রহ করে এবং অনেক অর্থ ব্যয় করে পানির ব্যবস্থা করতে হয়। তাও আবার সময় সাপেক্ষ। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় হাবীব (দঃ) সামান্য পানির উপর দস্ত মোবারক রাখার সাথে সাথে পানির প্রস্রবন প্রবাহিত হয়। এই পানির উৎস কোথায়? বেহেস্তের চারটি নহর ছিল এর উৎস। **হুযুরের হাত ছিল জমিনে–কিন্তু তার ক্রিয়া হয়েছিল জান্নাতে। এটা ছিল প্রাকৃতিক ক্ষমতার উর্দ্ধের শক্তি। এজন্যই "নবী কিরম (দঃ) ছিলেন অতিমানব এবং মহামানব। নবী করিম (দঃ) প্রয়োজনের সময় গায়েবী পানি দিতে পারেন– এটা ছিল সাহাবীগণের আক্বিদা। এই আকিদার নামই ছুন্নী আকিদা।**

(২) সামান্য পানিকে উছিলা করে পানির সাগর প্রবাহিত করার মধ্যে হেকমত হলো- "নাই" থেকে কিছু পয়দা করা আল্লাহর একক কুদরত। আর নবী করিম (দঃ) সামান্য কোন জিনিসকে উপলক্ষ করে তাতে বৃদ্ধি ঘটাতেন। এটা ছিল আল্লাহর সাথে আদব রক্ষা করা।

(৩) প্রশ্নঃ পৃথিবীর কোন্ পানি সর্বোত্তম? এর জবাব হলো- সাধারণ পানির চেয়ে অযুর পানি উত্তম। অযুর পানির চেয়ে যমযমের পানি উত্তম। আর যমযমের

www.sunnibarta.com

পানির চেয়েও উত্তম হলো হুযুর (দঃ)-এর দস্ত মোবারক হতে প্রবাহিত পানি (শামী)। তদ্রুপ দুনিয়ার যে মাটি নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারকের সাথে সংলগ্ন অর্থাৎ রওযা মোবারকের পবিত্র মাটি– তা আসমান, জমিন, কা'বা, বাইতুল মামুর, এমনকি– আরশ মোয়াল্লা হতেও উত্তম (শামী-যিয়ারত অধ্যায়)। **নবীর সাথে সম্পর্কের কারণে যদি মাটির এই মর্তবা হয়, তাহলে যে অন্তরে নবীর নূর ও জ্যোতি বিদ্যমান– সে অন্তরের মর্যাদা কি হতে পারে? আল্লাহ্ সকলকে উপলব্দির শক্তি দান করুন।**

মো'জেযা দু'প্রকার ঃ ইখ্‌তিয়ারী ও ইয্‌তিরারী

মোদ্দা কথা হলো–হোদায়বিয়ার একটি সফরেই অসংখ্য মো'জেযার প্রকাশ ঘটে। হুযুরের কোন কোন মো'জেযা ছিল ইখতেয়ারাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন। এটাকে ইখতেয়ারী মো'জেযা বলা হয়। যেমন-অঙ্গুলী থেকে পানি বের করা, স্বল্প খাদ্যে বরকত দান, বৃক্ষের আগমন ও প্রত্যাবর্তন, পানির উপর পাথরের সন্তরণ– ইত্যাদি।

আর কিছু মো'জেযা ছিল ইয্‌তিরারী বা এখতিয়ার বহির্ভূত। যেমন কোন কোন গায়েবের সংবাদ, কেয়ামতের তারিখ। এগুলো আল্লাহর ইচ্ছাধীন। (জা'আল হক-মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী)। তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিজে ব্যাপক ইলমে গায়েব শিক্ষা দিয়েছেন বলে ছুরা নিছার ১১৩ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে। (জালালাঈন দেখুন)।

ওহাবীরা প্রথম ধরনের মো'জেযাকে অস্বীকার করে। তারা বলে- "নবীর ইচ্ছায় কিছুই হয় না। মো'জেযার মধ্যে নবীর কোন এখতেয়ার নেই"। নাউযুবিল্লাহ। (দেখুন বদরে আলম মিরাটি -এর তরজুমানুস সুন্নাহ– ইসলামিক ফাউণ্ডেশন)।

সুস্পষ্ট বিজয় ঃ

হোদায়বিয়ার সন্ধিটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসন্তোষজনক মনে হলেও সুক্ষ্ম কুটনৈতিক বিচারে এটি মুসলমানদের জন্য বিরাট স্পষ্ট বিজয় সুচনা করেছিল। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এই সন্ধিকে "ফাতহাম মুবিনা" বা 'সুদূর প্রসারী স্পষ্ট বিজয়' বলে কোরআনে উল্লেখ করেছেন এবং মুসলমানগণকে শান্ত্বনা দিয়েছেন। সাথে সাথে এ ঘোষণাও দিয়েছেন যে, "নবী করিম (দঃ)-এর উছিলায় তাদের পূর্বাপর গুনাহসমূহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন" (সুরা ফাতাহ, আয়াত-২)

www.sunnibarta.com

মদিনার পথে ঃ

নবী করিম (দঃ) হোদায়বিয়ায় উট কোরবানী করে মাথা মুন্ডন করে ওমরার কাজ এখানেই সম্পন্ন করেন। সকলকে নিয়ে ১৯ দিন পর তিনি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে "কুরা গামীম" নামক স্থানে ১০ই মুহররম আশুরার দিনে সুরা ফাতাহ-এর প্রথম কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলীর অন্তর্নিহিত গুরু রহস্য অনুধাবন করতে সাহাবায়ে কেরামের কিছুটা অসুবিধা হয়েছিল। রাসুলে পাকের নির্দেশ শিরোধার্য করে নিলেও তাঁদের মনে ছিল বাহ্যিক ব্যর্থতার গ্লানি। তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁদের পূর্বাপর ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করার সুসংবাদবাহী শান্তনামূলক নিম্ন আয়াতটি নাযিল করলেন-

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ-

অর্থ ঃ "হে প্রিয় রাসুল! জেনে রাখুন-এটা পরাজয় নয়- বরং আমরা আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। আপনার উছিলায়ই আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের গুনাহসমূহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন"। (তাফসীরে কানযুল ঈমান ও রুহুল বয়ান)। যারা বলে– "নবীজীর গুণাহ ক্ষমা করা হয়েছে" তারা অপব্যাখ্যাকারী ও পথভ্রষ্ট। কেননা, নবীগণ সবসময়ই বে-গুণাহ্ বা মাসুম। তাই আয়াতটির সরাসরি শাব্দিক অর্থ করা মারাত্মক ভুল। সেজন্য তাফসীর ভিত্তিক অর্থ করতে হবে। কোরআন মজিদের বাংলা অনুবাদে শাব্দিক অর্থ করা জায়েয নয়–বরং তাফসীর ভিত্তিক অনুবাদ করতে হবে। এই দৃষ্টিতে দেখতে গেলে একমাত্র আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরেলী (রহঃ)–এর উর্দূ অনুবাদ "কানযুল ঈমান" স্বার্থক অনুবাদ প্রমাণিত হয়েছে।

www.sunnibarta.com